পরিবর্তনের পথ

সাজ্জাদ জহির

নব্বই দশক থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমিতে যেসব শক্তিশালী ইসলামি আন্দোলন দাড়িয়েছে সেগুলোর দিকে মনোযোগের সাথে তাকালে আমরা দেখতে পাই গণতন্ত্র, পশ্চিমা বিশ্বের সাথে লিঁয়াজো কিংবা বৈশ্বিক কুফুরী গোষ্ঠীর বেঁধে দেওয়া নিয়ম-কানুন ও রাজনৈতিক প্রলোভনসহ বহুবিধ চাকচিক্যময় আহ্বানকে উপেক্ষা করে অগ্রসর হওয়া বিপ্লবী জামাতগুলো সর্বপ্রকার মুসিবত ও বাধাবিপত্তির বেড়াজাল ছিন্ন করতে পেরেছে আলহামদুলিল্লাহ।

হত্যা, বন্দীত্ব, ড্রোন হামলা কিংবা অর্থনৈতিক অবরোধ সত্ত্বেও বিগত শতাব্দী থেকে নিয়ে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী ইসলামি আন্দোলন আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইয়েমেন, সোমালিয়া, মালি বা শামে নিজেদের দাওয়াতের কল্যাণ ও যথার্থতা প্রমাণ করেছে। যে আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর ছিল সময়ের ইমামদের নববি মানহাজ। তারা কোনো নতুন পথ আবিষ্কার করেননি। বরং দিগভ্রান্ত ও প্রতারিত উম্মাহকে পূর্ববর্তী নেককার ইমামদের দেখানো মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সঠিক সমরকৌশল ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সম্মান ও গৌরবের পথে ফিরিয়ে এনেছেন। যখনই এই মানহাজ পরিত্যাগ করা হয়েছে; জামাত বা আন্দোলন মুখ থুবড়ে পরেছে। যেমনটা আমরা কিছুটা দেখেছি ইরাক ও শামে।

বিগত শতাব্দীর শুরুতে জমিনের বুক থেকে তাওহিদের কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে অপসারিত হওয়ার পর থেকে, তামকিন ফিরিয়ে আনার প্রায়োগিক মেহনত ও আন্দোলন মূলত দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে আছেঃ-

1) ইখওয়ানি বা গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা
2) বিপ্লবী-জিহাদি চিন্তাধারা,

ইসলামি আন্দোলনগুলো গণতান্ত্রিক মানহাজের প্রবেশের পর থেকে মোটা দাগে ইখওয়ানি, দেওবন্দি, আজহারি, সালাফি ইত্যাদি মাসলাকের গণতান্ত্রিক মানহাজের মাঝে শাখাগত কিছু মতপার্থক্য থাকলেও, বাস্তব ময়দানে এই চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক মেহনতের মূল তাত্ত্বিক ঘুরেফিরে কয়েকজনই; যেমন—উস্তাদ হাসানুল বান্না, মাওলানা আবুল আলা মওদুদি, হাসান হুদাইফি, রশিদ ঘানুশি, ইউসুফ কারদাবি প্রমুখ। এই মানহাজের বর্তমান অনুসারীরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই ব্যক্তিদের দেয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই সাধারণত নিয়ে আসেন।

আর নববি মানহাজের পথিকৃৎদের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, উস্তাদ সাইদ কুতুব, শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম, শায়খ উসামা, শায়খ আইমান, শায়খ আবু মুসআব, শায়খ আবু বাকর, শায়খ আবু কাতাদা ও শায়খ মাকদিসি।

তাওহিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে মুসলিমদের ভূমিতে শরীয়াহর কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ইমামগণ রাজনৈতিক কৌশল সাজিয়েছেন দুই ধাপেঃ-

1) প্রথম ধাপে আফগানিস্তান, সোমালিয়া, মালি, ইয়েমেন, পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলের মতো বিপ্লবের উপযোগী ভূমিগুলো দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন করা এবং আমেরিকা, ফ্রান্সের মতো পরাশক্তিকে নিজ খোলসে ফিরিয়ে দেয়া। যেন আমেরিকা বা অন্য কোনো পরাশক্তি মুসলিম ভূমিগুলোতে হস্তক্ষেপের চিন্তাও না করে।

2) দ্বিতীয় ধাপে মিশর, তিউনিশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা সিরিয়ার মতো শক্তিশালী ও বিস্তৃত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সমতল ভূমির দেশ। যেগুলো মুক্ত করে নেয়া হবে পরাশক্তির প্রভাব নষ্ট হওয়ার পর।

ইমামদের চিন্তা ছিল, পরাশক্তির পতনের এসব অঞ্চলের ইসলামি আন্দোলনগুলো পর নিজেদের স্বাধীন করে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে নিবে। যেভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয়রা দুর্বল হয়ে পড়ায় উপনিবেশগুলোর জাতীয়তাবাদী নেতারা নিজেদের ভূমিকে

‘মুক্ত’ করে নিয়েছিল। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলো নিজেদের মুক্ত করেছিল।

কিন্তু আফসোস হলো এধরণের ভূমিগুলোতে রাজনৈতিকভাবে মুসলিমরা উচ্চাকাঙ্খী বা প্রস্তুত কোনোটাই ছিল না। যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাও সরলমনা, অপ্রস্তুত ইসলামপন্থীরা হারিয়েছে সুবিধাবাদী সেক্যুলারদের কাছে। আবার, সামর্থ্য ও সুযোগের অভাবে এজাতীয় দেশগুলোতে নববি মানহাজের আলোকে আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

প্রথম সারির ভূমিগুলোতে তাওহিদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার বাস্তবতা আলহামদুলিল্লাহ অনেকাংশেই এখন দৃশ্যমান। ফা লিল্লাহিল হামদ। কিন্তু, দ্বিতীয় সারির রাষ্ট্র তথা, অবশিষ্ট সমতল ভূমির দেশ, যেখানে শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী এবং সমাজ সেক্যুলার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বীকার; সেখানে বহুমুখী আন্দোলন চেষ্টা করা সত্ত্বেও দায়িত্ব অসমাপ্ত রয়ে যায়! অথবা বলা যায়, জিম্মাদারি আদায়ের প্রাথমিক চেষ্টাটিও করা সম্ভব হয়নি।

শায়খদের মানহাজকে উপেক্ষা করে স্থানীয়ভাবে যারা নানামুখী তত্ত্ব ও কর্মসূচী হাজির করছেন, তারা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন যে, তাওহিদের বিপ্লবের জন্য সামরিক শক্তিরও আগে প্রয়োজন সামাজিক শক্তি, যা ব্যতীত দীর্ঘমেয়াদী বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা কিংবা বিপ্লব সম্পাদন সম্ভব না। আফগানিস্তান, ইয়েমেন, সিরিয়া, সোমালিয়া বা মালিতে ইসলামি আন্দোলনের সফলতার অন্যতম কারণ, সেখানে মুসলিমদের বিদ্যমান থাকা সামাজিক শক্তি। প্রাচীন গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা, গৃহযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমাজতান্ত্রিক শাসনের অচলাবস্থা ইত্যাদি নানা কারণে এদেশগুলোতে জনসাধারণের মাঝে কেন্দ্রীভূত সেক্যুলার শাসনের প্রভাব হয়ে ছিল অত্যন্ত দুর্বল; যার সুযোগে উম্মতের ইমামরা সঠিক মানহাজের আলোকে দাওয়াহ ও জিহাদের মাধ্যমে বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন।

অন্যদিকে আরব বসন্ত পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু ভূমিতে একই বাস্তবতা উপস্থিত হলেও, যথাযথ প্রস্তুতি ও সামাজিক শক্তির অনুপস্থিতি মিশর, মরক্কো, তিউনিশিয়া ও লিবিয়াতে তা সফলতা এনে দিতে পারেনি। যদি এসব ভূমিতে আফগানিস্তান, ইয়েমেন বা মালির মতো পূর্ব থেকেই নেতৃত্ব, মানহাজ ও কার্যকর আল্লাহওআলাদের জামাত প্রস্তুত থাকতো তবে এমনটা হতো না।

শায়খ সালাহুদ্দিন জায়দান বলেন,

> “আরব বিপ্লবগুলি উত্তেজনা, দ্রুততা ও স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, তবে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল; তাই এ আন্দোলন সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা যেসব সমালোচনাযোগ্য কাজে পতিত হয়েছিলাম তা হলো—
>
> ক) এতদঞ্চলে (অর্থাৎ, পশ্চিম আফ্রিকা, আরবের সমতল ভূমির রাষ্ট্রগুলোতে) আন্দোলনের জোয়ার ও (অন্যান্য) ইসলামি দলগুলোর উপর নির্ভর করা।
>
> খ) পরিবর্তনের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব এবং কর্মসূচীর কাঠামোকে সঠিকভাবে ধারণ করতে না পারা।
>
> গ) ইসলামি দলগুলোর কাতারে সেক্যুলারদের জায়গা পাওয়া এবং হঠকারী স্বভাবের লোকজনকে একীভূত করা।
>
> আমরা এই গণজাগরণ এবং এতে অংশ নেয়া জামাতগুলোর মাঝে যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে পারিনি। জনগণের সামনে এই আন্দোলনের রুপরেখা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারিনি। এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য জনগণকে যথাযথ উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি।
>
> তদ্রূপ আমাদের এপর্যায়ে পৌছানো এবং আমাদের কার্যক্রম নিয়েও এদলগুলোর যথেষ্ট সংশয় ছিলো। তাই তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। বরং, আমাদের আক্রমণ করে বসেছে, সমালোচনা ও অবজ্ঞা করেছে।
>
> আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ’লার উপর ভরসা করার পর আমাদের জন্য আবশ্যক হলো চতুর্দিকে বিপ্লবী আন্দোলন সুবিন্যস্ত করা। আর জনগণ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, তার থেকে উন্নত অবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবে—এমন পরিস্থিতির জন্য বসে না থাকা।
>
> কেন আমরা সর্বত্র (মিশর, তিউনিশিয়া ইত্যাদি দেশে) ইসলামি আন্দোলনের উপর নির্ভরশীল ছিলাম? কেন ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে আমরা নিজস্ব জামাত তৈরী করতে পারিনি?

এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—সক্ষমতার অভাব।

আমাদের চিন্তাভাবনায় একথা চেপে বসেছিল যে: ইসলামি তেহরিক ও জামাতগুলো সময়ের চাকায় পিষ্ট হয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। তারা তাদের কর্মীদেরকে যথাযথ তরবিয়তের মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তুলেছে। এই কর্মীরা উম্মতের গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষমতা অর্জন করেছে, এবং আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নে যে কোন সুযোগকে কাজে লাগাতে পরিপক্ক হয়েছে।

এটাই আমাদের বড় একটি ভুল, যা সময়ই প্রমান করে দিয়েছে। আমরা ভুলের মধ্যে ছিলাম। আমরা বাস্তবতাকে ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম ঘটনাপ্রবাহ এবং সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার রীতিনীতিকে।"

(কিছুটা পরিমার্জিত)

গভীরভাবে চিন্তা করলে এ বাস্তবতাও স্বীকার্য যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমির ভৌগোলিক ও ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে কোথাও সঠিক মানহাজের আন্দোলন দ্রুত ও ব্যাপকতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার কোথাও তা প্রাথমিক পর্যায়েই স্থির হয়ে আছে। উপযোগী প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। আর উপযোগী পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে বিপ্লবী সংগঠন, দাওয়াত ও মেহনতের কোন বিকল্প নেই। জাতির মাঝে ব্যাপকভাবে তাওহিদের বিজয়ে বিশ্বাস এবং কুফরের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার অনুভূতি সঞ্চারণ ব্যতীত জিহাদী আন্দোলন দাঁড়াতে পারে না। ইসলামপন্থীদের বিরোধিতাকারীর তুলনায় সহানুভূতিশীলদের অংশ যদি ভারী না হয়, তাহলে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনস্থ সমতল ভূমিতে ব্যাপক বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালনা কিংবা বিশেষ প্রেক্ষাপট কাজে লাগানো প্রায় অসম্ভবই বটে।

তাই আমাদের দেশের মতো ভূমিতে সুসংগঠিত কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটানো অনেক জরুরি। বাস্তবতা হচ্ছে জাতির মাঝে বিশুদ্ধ আকিদা-মানহাজের দাওয়াতের বিস্তৃতি ছাড়া বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া সম্ভব না। যদি তাওহিদ ও নববি মানহাজের দাওয়াতের ব্যাপকতা না থাকতো, তবে আফগানিস্তান, শাম, ইয়েমেন কিংবা মালিতে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতো না কিংবা সফলতার সাথে চলমান থাকতে সক্ষম হতো না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তাই, সংগঠনগুলোর পাশাপাশি আলেম, অ্যাক্টিভিস্ট ও দা'ঈদের জন্য আবশ্যক পরিবার থেকে শুরু করে সর্বত্র বিশুদ্ধ আকিদা ও মানহাজের দাওয়াহ সরল ও বলিষ্ঠভাবে প্রচার-প্রসারে সময় ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু ব্যয় করা।

স্মর্তব্য যে, আপামর জনসাধারণের মাঝে বিপ্লবীদের দাওয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে—তাওহিদ, ইসলামি শাসনব্যবস্থা, আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র আকিদার ভিত্তিতে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা। এবং এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া যে, জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক সকল সমস্যার সমাধান ইসলামের শাসন ও বিধান নিশ্চিত করার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি প্রান্তসীমা থেকে নিয়ে সর্বত্র এই দাওয়াহকে প্রবল করা।

এই মেহনতের উদ্দেশ্য জনমানুষকে নবিগণের উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম করা, তথা জমিনে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইনসাফ ফিরিয়ে আনা। জনসাধারণকে কোন নির্দিষ্ট সংগঠনে যোগ দিতে বা সক্রিয় সমর্থন আদায়ে প্রভাবিত করতে হবে, এটা জরুরী না। বরং ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ যেন আল্লাহর হুকুম জানামাত্র মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করে, আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব উপলব্ধি করে, ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে আখিরাতমুখী হয়ে অল্পে তুষ্টির জীবনে আগ্রহী হয়, সামাজিক রাজনীতির স্থলে শরীয়াহর অনুগমনে অভ্যস্ত হয়। এটাই হবে আমাদের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাওহিদের দাবিই হচ্ছে-সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের সামনে সকল কিছুকে অবনত, অনুগত করা। বিশেষত, মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের প্রধানতম শত্রু আমেরিকা ইসরায়েলের নেতৃত্বাধীন জায়নবাদী চক্র এবং উপমহাদেশে শিরকের ইমাম ভারত ও তাদের তাবেদার স্থানীয় শাসক গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারেও জাতির সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোরদার প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে।

হাকিমুল উম্মাহ্ শায়খ আইমান আল মিসরি বলেন,

"দাওয়াতী কাজের মাকসাদ হচ্ছে; আগ্রাসী ক্রুসেডার (এবং ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসী প্রশাসন) এর হুমকির

> বিষয়ে উম্মাহ'কে সচেতন করে তোলা, তাওহিদের সঠিক ব্যাখ্যা তাদের নিকট পরিষ্কার করে দেওয়া যে, বিধান প্রণয়নের এবং সার্বভৌমত্ব কেবল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই অধিকারভুক্ত। এবং ইসলামভিত্তিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সকল স্থানের মুসলিমদের ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করা। আল্লাহ্'র ইচ্ছায় এইটা হবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি অনুসারে খিলাফত প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন। এ পর্যায়ে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড দুইটি স্তরে সম্পন্ন হবে, যার একটি হচ্ছে-জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে এর উপর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কঠিন চেষ্টা করা যেন তারা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচারণ করে ইসলামের পক্ষাবলম্বন করে এবং ইসলামের জন্য কাজ করে।"

সুতরাং, দাওয়াতি ও তরবিয়তি মেহনত চলবে প্রথমত জাতির উত্তম অংশটির মাঝে, যেন বিপ্লবের নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন তার উপযোগী লোক পেয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ আন্দোলনের ধারা জারি রাখা সম্ভব হয়। এছাড়াও, জাতির মাঝে সুসংগঠিত দাওয়াতি ও তরবিয়তি মেহনত জারি রাখা প্রয়োজন হবে, যেন উপযোগী পরিস্থিতি ও উপকরণ সাপেক্ষে বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্বে জাতি ইসলামি বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।

যারা কেবল সামরিক শক্তির পেছনে সময় দেয়ার মতো অপরিণামদর্শী মানহাজ আঁকড়ে ধরেছে; তাদেরকে বলা হবে, সামরিক শক্তি কেবল অন্যান্য শক্তিকে পূর্ণতা দিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পথ সুগম করে। অপূর্ণাঙ্গ মানহাজের আলোকে পথ চলে, নিজেদের সমাজে অপ্রাসঙ্গিক করে এবং স্থবিরতার শিকার হওয়ার ফলাফল জানার জন্য বিগত ত্রিশ বছরের ইসলামি সামরিক আন্দোনগুলোর ব্যর্থতার ইতিহাস অধ্যায়নই যথেষ্ট হবে।

আর যারা সব ধরণের সংঘাতের রাস্তা এড়িয়ে নরম, গৎবাঁধা ও আরামদায়ক মানহাজ আঁকড়ে ধরেছেন, তাদের জেনে রাখা উচিৎ—সংঘর্ষ অনিবার্য।

যদি সংঘর্ষের আগেই শুধু দাওয়াহ ও ইদাদের মাধ্যমে, তামকিন (কর্তৃত্ব) অর্জন হয়, তাহলে পরবর্তীতে দীর্ঘ ও তীব্র সংঘর্ষের প্রয়োজন হয়। যেমন—মদীনায় প্রয়োজন ছিল। আর যদি তীব্র সংঘর্ষের পর তামকিন আসে, সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে শুধুমাত্র দাওয়াহ ও ইদাদ চলমান থাকাই যথেষ্ট হয়। যেমন—আফগানিস্তান।

তাই, ইসলামি শাসনব্যবস্থা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মারহালা হিসেবে ইসলামি আন্দোলনের উচিৎ এক আল্লাহর দাসত্বের অপরিহার্যতার ভিত্তিতে সমাজে মেরুকরণ সৃষ্টিতে গুরুত্ব দেয়া। যেন সেক্যুলার কুফরি শাসনের অধীন থেকে মুসলিমদের অন্তত ঐ পরিমাণ অংশ তাওহিদের পতাকাতলে চলে আসে, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে যাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখার সক্ষমতা রয়েছে। এজন্য অবশ্যই ইসলামি আন্দোলনকে উপযোগী পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিবিধান, এমনকি প্রয়োজনে তীব্র ও সরাসরি সংঘাতের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এই দুই স্তরেই নবিগণের উত্তরসূরীদের আত্মত্যাগ ও সুউচ্চ হিম্মতের পাশাপাশি ঈমানী সংহতি ও ফিকরি পরিকপক্কতার প্রয়োজন পড়বে।

উস্তাদ আবুল আলা মওদুদির অনেক বিষয়ের সাথে একমত হবার সুযোগ নেই তা অনেকের কাছেই স্পষ্ট। তবে উনার কিছু আলোচনা থেকে দিকনির্দেশনা লাভেরও প্রয়োজন রয়েছে। আধুনিক সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্র ও ইসলামি রাষ্ট্র সংক্রান্ত কিছু সুন্দর, জরুরী আলোচনা তিনি করেছেন। যেহেতু বাংলাদেশ বর্তমানে একটি সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্র (nation-state), আর আমরা চাচ্ছি এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিলোপ করে ইসলামের শাসন ফিরিয়ে আনতে। তাই উস্তাদ মওদুদির বক্তব্য থেকে আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্র ও ইসলামি শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা সম্পর্কে ধারণা পেতে উস্তাদ মওদুদি (রহ.)'র বক্তব্য তুলে ধরছি—

> আমরা যে রাষ্ট্রকে 'ইসলামি রাষ্ট্র' বলে আখ্যায়িত করেছি, তার প্রকৃত রূপটা কি? কি তার প্রকৃতি? কি তার ধরণ? কি তার বৈশিষ্ট্য ও আসল পরিচয়? – তা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, জাতীয়তাবাদের নাম গন্ধও এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ জিনিসটিই ইসলামি রাষ্ট্রকে অন্য সব ধরণের রাষ্ট্র থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এ হচ্ছে নিছক একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এ ধরণের রাষ্ট্রকে আমি ইংরেজীতে 'Ideological State' বলবো। এমন আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের সাথে মানুষ সব সময় পরিচিত ছিল না। আজও পৃথিবীতে এ ধরণের কোন আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই। প্রাচীনকালে মানুষ বংশীয় বা শ্রেণীগত রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত ছিলো। অতপর গোত্রীয় এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত হয়। এমন একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের কথা মানুষ তার সংকীর্ণ মানসিকতায় কখনো স্থান দেয়নি, যার আদর্শ গ্রহণ করে নিলে বংশ, গোত্র, জাতি

ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদার হয়ে যাবে।

খৃষ্টবাদ এর একটি অস্পষ্ট নকশা লাভ করেছিল। কিন্তু সেই পূর্ণাঙ্গ চিন্তা কাঠামো তারা লাভ করেনি, যার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ফরাসী বিপ্লবে আদর্শিক রাষ্ট্রের একটি ক্ষীণ রশ্মি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল বটে, কিন্তু তা অচিরেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অন্ধ গহবরে তলিয়ে যায়। কমিউনিজম আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা বিশেষভাবে প্রচার করে। এমনকি এ মতবাদের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপনেরও কোশেশ করে। এর ফলে বিশ্ববাসীর মনে আদর্শিক রাষ্ট্রের ক্ষীণ ধারণাও জন্ম নিতে থাকে। কিন্তু অবশেষে এর ধমনীতেও ঢুকে পড়লো জাতীয়তাবাদের যাবতীয় তীর্যক ভাবধারা। জাতীয়তাবাদ কমিউনিজমের আদর্শিক ধারণাকে ভাসিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিলো সমুদ্রের তলদেশে।

পৃথিবীর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একমাত্র ইসলামই হচ্ছে একমাত্র সেই আদর্শ নীতি, যা জাতীয়তাবাদের যাবতীয় সংকীর্ণ ভাবধারা থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিরেট আদর্শিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আর একমাত্র ইসলামই হচ্ছে সেই মহান আদর্শ, যা গোটা মানব জাতিকে তার এই আদর্শ গ্রহণ করে অজাতীয়তাবাদী বিশ্বজনীন রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানায়।

বর্তমান বিশ্বে যেহেতু এমন একটি রাষ্ট্রের ধারণা অপরিচিত এবং যেহেতু বিশ্বের সবগুলো রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবস্থা এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই কেবল অমুসলিমরাই নয়, স্বয়ং মুসলমানরা পর্যন্ত এমন একটি রাষ্ট্র এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা (implications) অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে বটে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করেছে পুরোপুরিভাবে ইউরোপীয় ইতিহাস, রাজনীতি, ও সমাজ বিজ্ঞান (Social science) থেকে, তাদের মন মস্তিস্কে এ ধরণের আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা কিছুতেই স্থান পায় না। উপমহাদেশের বাইরেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেসব দেশেও এ ধরণের লোকদের হাতেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এসেছে। জাতীয় রাষ্ট্র (National State) ছাড়া আর কোনো ধরণের রাষ্ট্রের কথা কল্পনাও করতে পারেনা। কারণ, তাদের মনমস্তিষ্ক তো ইসলামের জ্ঞান, চেতনা এবং আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই উপমহাদেশেও যারা সে ধরণের শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছে, তারাও এ জটিল সমস্যায় জর্জরিত।

ইসলামি রাষ্ট্রের নাম মুখে এরা উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু যে শিক্ষা দীক্ষায় বেচারাদের মস্তিষ্ক গঠিত হয়েছে, তা থেকে ঘুরে ফিরে কেবল সেই 'জাতীয় রাষ্ট্রের' চিত্রই বারবার তাদের সামনে ভেসে উঠে। জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ এরা কেবল জাতি পূজার (Nationalistic Ideology) বেড়াজালেই ফেঁসে যায়। তারা যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর কথাই চিন্তা করুক না কেন, তা করে থাকে জাতীয়তাবাদেরই ভাবধারার ভিত্তিতে। ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গতানুগতিক ধারণা পোষণ করে।

তারা মনে করে, 'মুসলমান' নামের যে 'জাতিটি' রয়েছে, তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা অন্তত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এলেই তা ইসলামি রাষ্ট্র হবে। আর এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তারা যতোই চিন্তাভাবনা করে, অন্যান্য জাতির অবলম্বিত কর্মপন্থা ছাড়া নিজেদের সেই জাতিটির জন্যে অন্য কোন কর্মপন্থাই তাদের নজরে পড়েনা। এই ধারণাই তাদের মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেসব উপায় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, তারাও ওসব উপায় উপাদানের সমন্বয়েই তাদের জাতিটিকে গঠন করবে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে দেয়া হবে। তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হবে। জাতীয় গার্ডবাহিনী সংগঠিত করা হবে। গঠন করা হবে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী। যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, সেখানে গণতন্ত্রের স্বীকৃত নীতি 'সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন' (Majority Rule) এর ভিত্তিতে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠিত হবে। আর যেখানে তারা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের 'অধিকার' সংরক্ষিত হবে।

তারা মনে করে, তাদের স্বাতন্ত্র্য ঠিক সেভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত, যেভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রতিটি সংখ্যালঘু জাতি (National Minority) নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়। তারা চায়, শিক্ষা, চাকুরী এবং নির্বাচনী সংস্থাসমূহে নিজেদের কোটা নির্ধারিত হবে। নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরা নির্বাচন করবে। ইত্যাদি

ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী চিন্তা তাদের চিন্তাশক্তিকে গ্রাস করে রেখেছে। এসব জাতীয়তাবাদী চিন্তা প্রকাশ করার সময় তারা উম্মাহ্, জামায়াত, মিল্লাত, আমীর, ইতায়াত প্রভৃতি ইসলামি পরিভাষাই মুখে উচ্চারণ করে। কিন্তু এই শব্দগুলো তাদের কাছে জাতীয় ধর্মবাদের জন্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীরই সমার্থক। সৌভাগ্যবশতঃ তারা এ শব্দগুলো পুরানো ভাড়ারে তৈরি করাই পেয়ে গেছে এবং এগুলো দিয়ে তাম্র মুদ্রার উপর স্বর্ণমুদ্রার মোহরাংকিত করার সুবিধে পাচ্ছে।

আপনারা যদি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের সঠিক পরিচয় উপলব্ধি করে নিতে পারেন, তাহলে একথাটি বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না যে, এ ধরণের জাতীয়তাবাদী চিন্তাপদ্ধতি, কার্যসূচি তো দূরের কথা, বরঞ্চ এ মহান কাজের সূচনাই হতে পারেনা। সত্য কথা বলতে কি, জাতীয়তাবাদের প্রতিটি অঙ্গ একেকটি তীক্ষ্মধার কুঠারের মতো, যা আদর্শিক রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করে, তাকে বিনাশ করে দেয়।

আদর্শবাদী রাষ্ট্র যে ধারণা (idea) পেশ করে, তার মূল কথাই হচ্ছে, আমাদের সামনে 'জাতি' বা 'জাতীয়তাবাদের' কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের সামনে রয়েছে শুধু মানুষ বা মানব জাতি। তাদের কাছে আমরা এক মহান আদর্শ এ উদ্দেশ্যে পেশ ও প্রচার করবো যে, এ আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যেই তাদের সকলের কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত রয়েছে। এই আদর্শ গ্রহণকারী সকল মানুষ ঐ আদর্শিক রাষ্ট্রটি পরিচালনায় সমান অংশীদার।

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, যে ব্যক্তির মন মগজ, ভাষা বক্তব্য, কাজ কর্ম, তৎপরতা প্রভৃতি প্রতিটি জিনিসের উপর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতিপূজার মোহরাংকিত হয়ে আছে, সে কী করে এই মহান বিশ্বজনীন আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে সক্ষম হবে? সংকীর্ণ জাতি পূজায় অন্ধ বিভোর হয়ে সে নিজের হাতেই তো বিশ্বমানবতাকে আহ্বান জানাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথম কদমেই তো সে নিজের পজিশনকে ভ্রান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত করেছে। বিশ্বের যেসব জাতি জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে আছে, জাতিপূজা এবং জাতীয় রাষ্ট্রই যাদের সমস্ত ঝগড়া লড়াইয়ের মূল কারণ, তাদের পক্ষে বিশ্ব মানবতাকে কল্যাণের আদর্শের প্রতি আহ্বান করা সম্ভব নয়। যারা নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্র এবং নিজ জাতির অধিকারের জন্যে ঝগড়ায় নিমজ্জিত, তারা কি বিশ্ব মানবতার কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে? লোকদেরকে মামলাবাজী থেকে ফিরানোর আন্দোলন আদালতে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে আরম্ভ করা কি যুক্তিসংগত কাজ হতে পারে?

ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তার গোটা অট্টালিকা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণার মূল কথা হলো, বিশ্ব সাম্রাজ্য আল্লাহর। তিনিই এ বিশ্বের সার্বভৌম শাসক। কোনো ব্যক্তি, বংশ, শ্রেণী, জাতি, এমনকি গোটা মানবজাতিরও সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আইন প্রণয়ন এবং নির্দেশ দানের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট।

এই রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে, এখানে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। আর এ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা মানুষ সঠিকভাবে লাভ করতে পারে মাত্র দুটি পন্থায়। হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো মানুষের নিকট আইন ও রাষ্ট্রীয় বিধান অবতীর্ণ হবে এবং তিনি তা অনুসরণ ও কার্যকর করবেন। কিংবা মানুষ সেই ব্যক্তির অনুসরণ ও অনুবর্তন করবে, যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন ও বিধান অবতীর্ণ হয়েছে।

এই শাসন পরিচালনার কাজে এমন সব লোকই অংশীদার হবে, যারা এই আইন ও বিধানের প্রতি ঈমান আনবে এবং তা অনুসরণ ও কার্যকর করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। তাদেরকে এরূপ স্থায়ী অনুভূতির সাথে এ মহান কাজ পরিচালনা করতে হবে যে, সামষ্টিকভাবে আমাদের সকলকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককে এর জন্যে সেই মহান আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই যার অবগতিতে রয়েছে। যার জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই গোপন নেই।

এই চিন্তা প্রতিটি মূহুর্তে তাদের এ অনুভূতিকে জাগ্রত রাখবে যে, মানুষের উপর নিজেদের হুকুম ও কর্তৃত্ব চালানোর জন্যে, জনগণকে নিজেদের গোলাম বানানোর জন্যে, তাদেরকে নিজেদের সম্মুখে মাথা নত করতে বাধ্য করার জন্যে, তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে নিজেদের জন্যে বিলাসবহুল অট্টালিকা নির্মাণ করার জন্যে,

আর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিলাসিতা, আত্মপূজা এবং হঠকারিতার সামগ্রী পূঞ্জিভূত করার জন্যে আমাদের উপর খিলাফতের এই মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। বরঞ্চ এই বিরাট দায়িত্ব আমাদের উপর এই জন্যে অর্পিত হয়েছে, যেনো আমরা আল্লাহর বান্দাদের উপর তাঁরই দেয়া ইনসাফ ভিত্তিক আইন ও বিধান কার্যকর করি এবং নিজেরা নিজেদের জীবনে তা পুরোপুরি অনুসরণ ও কার্যকর করি। এই বিধানের অনুসরণ এবং তা কার্যকর করার ব্যাপারে আমরা যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করি, এ কাজে যদি অনূ পরিমাণ স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিদ্বেষ, পক্ষপাতিত্ব, কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার অনুপ্রবেশ ঘটাই, তাহলে আল্লাহর আদালতে এর শাস্তি অবশ্যি আমাদেরকে ভোগ করতে হবে, দুনিয়ার জীবনে শাস্তি ভোগ থেকে যতোই মুক্ত থাকি না কেন?

এই মহান আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় অট্টালিকা তার মূল ও কান্ড থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শাখা প্রশাখা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে ধর্মহীন রাষ্ট্র (Secular States) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে। তার গঠন প্রক্রিয়া, স্বভাব প্রকৃতি সবকিছুই সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এক বিশেষ ধরণের মানসিকতা। এক স্বাতন্ত্রধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এক অনুপম কর্মনৈপূণ্য। এ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, কোর্ট কাচারী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন কানুন, কর ও খাজনা পরিচালনা পদ্ধতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি প্রভৃতি সব বিষয়ই ধর্মহীন রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ইসলামি রাষ্ট্রের কেরানী, এমনকি চাপরাশী হবারও যোগ্য নয়।

মোট কথা, ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী করে যেসব লোক তৈরি করা হয়েছে এবং সে ধরণের রাষ্ট্রের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগ, পরিচালনা যন্ত্রের প্রতিটি অংশ সম্পূর্ণ নতুনভাবে নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে।

এ রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজন এমন সব লোকের, যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা আল্লাহর সম্মুখে নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে বলে তীব্র অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ ক্ষতি পার্থিব লাভ ক্ষতির চাইতে অধিক মূল্যবান। যারা সর্বাবস্থায় সেইসব আইন কানুন নিয়মনীতি ও কর্মপন্থার অনুসরণ করবে, যা তাদের জন্যে বিশেষভাবে প্রণীত হয়েছে। তাদের যাবতীয় চেষ্টা তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ব্যক্তিগত আর জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব আর কামনা বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে তাদের গর্দান হবে সম্পূর্ণ মুক্ত। হিংসা বিদ্বেষ আর দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে তাদের মন মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। ধনসম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উন্মাদ হবার নয়। ধনদৌলতের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর হবার নয়।

এইরূপ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন, পৃথিবীর ধনভান্ডার হস্তগত হলেও, যারা নিখাঁদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা বিনিদ্র রজনী কাটাবে। আর জনগণও যাদের সুতীব্র দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণাধীনে নিজেদের জানমাল, ইজ্জত আবরুসহ যাবতীয় ব্যাপারে থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন।

ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এমন একদল লোকের, যারা কোনো দেশে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদের ধ্বংসলীলা, জুলুম নির্যাতন, গুন্ডামী বদমায়েশী এবং ব্যভিচারের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবেনা। বরঞ্চ বিজিত দেশের অধিবাসীরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জানমাল, ইজ্জত আবরু ও নারীদের সতীত্বের পূর্ণ হিফাযতকারী।

এ ধরণের এবং কেবলমাত্র এধরণের লোকদের দ্বারাই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেবলমাত্র এরূপ লোকেরাই ইসলামি হুকুমাত পরিচালনা করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী স্বার্থান্বেষী (Utilitarian Mentality) লোকদের দ্বারা কিছুতেই একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে পারেনা।

বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এরূপ লোকদের অস্তিত্ব অট্টালিকার অভ্যন্তরে উইপোকার অস্তিত্বের মতোই বিপজ্জনক। এরা পার্থিব স্বার্থ এবং ব্যক্তি ও জাতির স্বার্থে নিত্য নতুন নীতিমালা তৈরি করে। এদের মগজে না

আছে আল্লাহর ভয়, না পরকালের। বরঞ্চ তাদের সমগ্র চেষ্টা তৎপরতার এবং নিত্য নতুন পলিসির মূলকথা হচ্ছে কেবলমাত্র পার্থিব লাভ লোকসানের ‘ধান্দা’।

এখন, নবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ কেমন হতে পারে সে ব্যাপারে আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে।

এখানে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের আলোকে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক দিক আলোচনা করা হবে। যেহেতু, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শারঈভাবে ও বাস্তবিকভাবে অকার্যকর ও বাতিল সাব্যস্ত করা হয়, তাই এসংক্রান্ত আলোচনার কোনোই অবকাশ নেই। তাই এ ব্যাপারে আলোচনার কিছু নেই। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিতের আলোকে দাওয়াহ, তরবিয়ত ও সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কর্মকৌশলের প্রকাশ আমাদের দেশে কেমন হতে পারে তার বিবরণ নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে কিছু বিষয়ে ধারণা অন্তত প্রয়োজন।

আমরা জানি, তীব্র সংঘাত ছাড়া ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না। আমাদের মতো দেশে বারবারই দেখেছি সৈনিক-পেশাজীবী ও ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আদর্শিক আন্দোলনের পথ ধরেই এপথে সফলতা আসে। তবে মানুষের সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা, মিথ্যার বিরুদ্ধে তীব্র ও শক্তিশালী অবস্থানের ভিত্তিতে যোগ্য, আত্মত্যাগী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সংগঠিত শক্তির উপস্থিতি অর্জনের আগে বিচ্ছিন্ন সংঘাত-সহিংসতা কোনো ফলাফল এনে দিবে না। তাই এ পথ কোন ত্বরাপ্রবণ, অতিআবেগীর পথ নয়। তাওহিদের আকিদা, নববি সুন্নাত ও সালাফদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব ও অনুসারীদের সমন্বয়ে অগ্রসরমান সংগঠন ব্যতীত দ্বীন কায়েমের আশা করা ভুল। ধারাবাহিক দাওয়াহ, তরবিয়ত, সংগ্রাম ও সংশোধনের পথ ধরেই আদর্শিক দৃঢ়তা, বৈপ্লবিক চেতনা ও রাজনৈতিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা অর্জনে সক্ষম সংগঠিত শক্তি গড়ে ওঠে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে—স্রেফ ক্ষমতা, অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভকে উদ্দেশ্য করা সুস্থ চিন্তার কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না। একজন মুসলিমের জন্য তো নয়ই। আমরা মুসলিমরা আমাদের আদর্শকে বিজয়ী দেখতে চাই। শাসক হবার উদগ্র বাসনার চেয়ে, শরীয়াহ শাসিত হবার আগ্রহই আমাদের বেশি। অর্থাৎ, কেবল ক্ষমতা ও ব্যবস্থার পালাবদল নিজেদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হতে পারেনা। বরং, যেহেতু আদর্শিক বিপ্লব ব্যতীত মানুষ ও সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন সম্ভব না, সেহেতু আমরা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কথা বলছি মাধ্যম হিসেবে।

[illegible] ?

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, রাষ্ট্র একটি জাগতিক বিষয়, যা সর্বজনীন। পার্থক্য শুধু মূল্যবোধের। একটি ইসলামি রাষ্ট্র ইসলামি শরীয়াহর ভিত্তিতে পরিচালিত, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কমিউনিজমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথও সুনির্দিষ্ট। আর শরীয়াহ সেদিকেই আহবান করে যাতে আছে দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও মর্যাদা। (জাতিরাষ্ট্রের ধারণা, কাঠামো এবং ইসলামি শাসনব্যবস্থার ধারণা ও কাঠামোর মৌলিক পার্থক্য উপেক্ষা করে বলা হয়নি।)

তাই, বাস্তবতা উপলব্ধি করে শরীয়াহর পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান অন্যদের তুলনায় সহজ ও দ্রুততমভাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে। কেননা, মুসলিমদের সাথে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার তাওফিক, ওয়াদা ও সাহায্য। আরও রয়েছে সর্বোত্তম পথনির্দেশ—কুরআন ও সুন্নাহ ।

এটাও ইতিমধ্যেই স্পষ্ট যে—সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে আদর্শিক বিপ্লব অপরিহার্য। ইতিহাসের আলোকে আদর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন বিপ্লবের কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতেই হয় মর্মে আমরা দেখতে পাই। কাঙ্ক্ষিত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রূপরেখার ব্যাপারে একটি ধারণা আমরা এভাবে দেখতে পারি—

১। আদর্শিক দাওয়াহর আত্মপ্রকাশ। যা ন্যারেটিভ বিনির্মাণ, বিপ্লবী আদর্শ ধারণকারী অগ্রগামী ব্যক্তিদের (যাদের অন্তরে দ্বীনের বুঝ ও চেতনা প্রবেশ করেছে। যারা আত্মত্যাগী, দূরদর্শী, জ্ঞানী) সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। (মাক্কি যুগের প্রথম ৩, মতান্তরে ৪ বছর রাসুলুল্লাহ (সা) এর গোপন দাওয়াহ-তরবিয়তের স্তরে দেখা যায়)।

২। বিপ্লবী সংগঠিত শক্তির মাধ্যমে সমাজে আদর্শিক দাওয়াহর ব্যাপক প্রচার-প্রসার। এক্ষেত্রে তারা শত প্রলোভন ও বাধার মুখেও

সমাজে আদর্শের মূর্তরূপ হিসেবে নিজেদের অবস্থান জানান দেয় ও বিকশিত হতে থাকে। (যা মাক্কি যুগের বাকি সময়ে দেখা গিয়েছে, বাইয়াতে আকাবার আগ পর্যন্ত)

৩। বৈপ্লবিক সংগঠিত শক্তির ধারাবাহিক আত্মত্যাগ ও নেতৃত্বের ফলে সমাজে আদর্শিক মেরুকরণ সম্পন্ন করা হয়। যা সম্পন্ন হবে আত্মত্যাগী, দৃঢ় ও শক্তিশালী দাওয়াহ ও সাংগঠনিক মেহনতের মাধ্যমে।

আমাদের প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে—সেক্যুলার রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে বিপ্লবী শক্তির নেতৃত্বে থাকা ইসলামপন্থীদের ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হওয়া। (যেমন—২০১৩ এর আগেও হেফাজত শক্তিশালী ছিল। শাহবাগ কেবল তাদের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে।)

৪। মেরুকরণ সম্পন্ন হবার পর বিপ্লবী পরিস্থিতি প্রস্তুতে কর্মসূচি তীব্রতর করা, যেন পূর্বতন ব্যবস্থার প্রতিস্থাপনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। এবং পরিস্থিতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তীব্র সংঘাতের পথ মাড়িয়ে পূর্বতন শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা।

৫। শাসনব্যবস্থা প্রতিস্থাপন পরবর্তী কার্যক্রম। এই স্তরটিই সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ধারণ করবে। যে স্তরের জন্যই মূলত পূর্ববর্তী স্তরগুলোর প্রস্তুতি নেয়া হয়।

(মদিনায় খন্দকের যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি এই স্তর ছিল)। যে স্তরেই সাধারণত আপোষ বা ব্যর্থতা বিপ্লবকে নস্যাৎ করে দেয়।

৬। ক্রমাগত শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করা। সভ্যতাগত উপাদানগুলো সক্রিয় ও ব্যাপক করা। (সাহাবাদের জীবনের আলোকে যা আমরা দেখি ক্রমান্বয়ে মক্কা বিজয়, পারস্য, রোম, সিরিয়া, স্পেন বিজয়ের মাধ্যমে সুসংহত হওয়ার মাধ্যমে) ।

প্রশ্ন হচ্ছে সমাজে ইতিমধ্যেই বিরাজমান ইসলামি শক্তি উপস্থিত। এছাড়াও বিপ্লবের স্বপক্ষে আওয়াজ তোলার লোকের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তাওহিদ ও কুফরের মেরুকরণের ব্যাপারেও মানুষ একদম অজ্ঞ নয়। স্রেফ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরেই মুসলিমরা সংকটাপন্ন। সেক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বৈপ্লবিক আন্দোলনকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে কিভাবে আমরা বুঝব? সহজভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে চার স্তরে বিন্যস্ত করা যায়—

- মেরুকরণ (Polarisation):

  সাম্রাজ্যবাদী বা আধিপত্যবাদী শক্তির তাঁবেদার সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা ও তার সর্বব্যাপী জুলুমের বিরুদ্ধে মেরুকরণ তৈরিতে কাজ করতে হবে। এবং বিপ্লবের উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সংগঠিত শক্তির বিকাশ ঘটতে হবে। আর এমনটা গণমানুষকে সঠিক ইসলামি দাওয়াহ ও ন্যারেটিভের আলোকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। আর রাজনৈতিক মেরুকরণ সম্পন্ন করার পূর্বশর্ত হচ্ছে—ইসলাম ও মুসলিমদের সামজিকভাবে আধিপত্য অর্জন।

  বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোকে বলতে গেলে—‘৭১ এ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট তৈরিতে ‘৬০ এর দশকে (৬২-৭০) স্বাধীকার আন্দোলনই মূল ভূমিকা রেখেছিল।

- তীব্রতাবৃদ্ধি (Escalation):

  শাসকগোষ্ঠী ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হলে আন্দোলনের দাবি ও প্রকৃতিকে তীব্র করে তোলা। সাধারণত এমন অবস্থায় জনবিচ্ছিন্ন শাসকগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকে। এমতাবস্থায় জনরোষ প্রচন্ড হয়ে উঠতে থাকে স্বল্প সময়ের ব্যাবধানে।

  যেমনটা আমরা দেখেছি ‘৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার মুহূর্ত তৈরিতে।

- অভ্যুত্থান (Upheaval):

  আন্দোলন তীব্রতা বৃদ্ধির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেলে, যালিম শাসকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সম্পন্ন হবে; তখন তাদের মাঝে থাকা বিপ্লবীদের নেতৃত্বে জনমানুষকে সাথে নিয়ে বিপ্লবী শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে। যেমন—আরব বসন্তে মিশর ও তিউনিশিয়াতে দেখা গেছে। বা ‘৯০ এর এরশাদবিরোধী অভ্যুত্থানে দেখা গেছে।

  ক্ষেত্রবিশেষে অরাজকতাও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ২৫শে মার্চের কথা বলা যায়। সেক্ষেত্রে জনযুদ্ধের মাধ্যমেই অভ্যুত্থান সম্পন্ন হবে।

- প্রতিষ্ঠালাভ (Consolidation):

  অভ্যুত্থান পরবর্তী অরাজক অবস্থার যথাযথ ব্যবস্থাপনা, পূর্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিলোপ ঘটিয়ে নতুন বিপ্লবী সরকার গঠন ও ক্ষমতা সুসংহতকরণ। এক্ষেত্রেই সাধারণত দুর্বলতা দেখা যায় এবং অভ্যুত্থান আর বিপ্লবে পরিণত হতে পারেনা।

বিপ্লবের সফলতা, ব্যর্থতার অনেক কিছুই নির্ভর করে 'মেরুকরণ' স্তরে সুসংগঠিত ও ধারাবাহিক বিপ্লবী মেহনতের উপর। এই স্তর বিপ্লবী আন্দোলনের সবচেয়ে কষ্টকর ও দীর্ঘায়িত স্তর। এস্তরে ধারাবাহিক ও ক্রমবিকশিত কর্মসূচীর মাধ্যমে আদর্শিক, রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সংগঠন ও নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এবং এই স্তরেই জনসাধারণের চিন্তার জগতে বিপ্লবের বীজ বপন করা হয়। এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা অন্য কোনো সময় করা যাবে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েই ধারাবাহিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে। এটি এমন একটি মূলনীতি যে ব্যাপারে মাও সে তুং ও চে গুয়েভারা উভয়েই একমত—

> The matters on which they agree are: The population as the key to victory, the importance of political, and the importance of context when developing strategy.

আসলে, ব্যাপকভাবে জনসমর্থন আদায় সম্ভব হলে জনসাধারণ, সামরিক ও সরকারি বাহিনীর উন্নত অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগিয়ে আসে এবং বিপ্লবে নিয়ামক ভূমিকা রাখে। এপরিস্থিতি উপস্থিত হবার আগে ক্রমান্বয়ে বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। প্রধাণ দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে মেরুকরণকে প্রাথমিক লক্ষ্য সাব্যস্ত করে বিপ্লবী আন্দোলন এগোতে হবে সঠিক, যোগ্য নেতৃত্ব ও সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে। এজন্যই ইসলামপন্থীদের জন্য মেরুকরণ ও সংগঠন প্রশ্নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণই সর্বাগ্রে করণীয়

সালাহুদ্দিন জায়দান বলেন,

> বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য অবশ্যই যোগ্য নেতৃত্ব, সংগঠিত সংগঠন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আর এই মৌলিক উপকরণটির অভাবের কারণেই আরব বিপ্লব রাষ্ট্রীয় শোষণের নিচে চাপা পড়ে যায় এবং জনসাধারণের আশা নিরাশায় পরিণত হয়।

আমরা ইতিহাস ও রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে দেখতে পাই সমাজে বিদ্যমান বিরোধ বা দ্বন্দ অনিবার্যভাবেই বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট অনিবার্য করে তোলে।

ব্যবহারিক রাজনীতির জন্য প্রাচীণ বামপন্থা (অর্থোডক্স লেফট) বিপ্লবের পরিণতি লাভের প্রশ্নকে দুই ভাগে ভাগ করে—

√ Objective Condition: একটি হচ্ছে বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতি যা নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা (Objective Condition) নামে পরিচিত। যা নানা রকম বিচ্ছিন্ন ও স্বতঃস্ফূর্ত আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তৈরী হয়। যেমন, ২০১৪ থেকে ২০২৪ এর জুলাই অবধি বিএনপি-জামাআতের মতো বুর্জোয়া লিবারেল দলগুলোর আন্দোলন ও হাসিনার স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতি তৈরি হয়।

বিপ্লবের Objective condition স্বতঃস্ফূর্তভাবেও হাজির হতে পারে। যেমন, ২০১৩ সালের হেফাজতে ইসলামির উত্থান এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছিল অনেকটা (শাহবাগের উত্থানের ফলে) প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হিসেবে। একইভাবে হাসিনা শাসনের বিরুদ্ধে জুলাই'২৪ এও একই ঘটনা দেখা যায়।

√ Subjective Condition: অপর দিক হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনা ও সাংগঠনিক শক্তির বাস্তবতা (Subjective Condition)। অর্থাৎ, বৈপ্লবিক শক্তির সক্ষমতা পরিমাপের আলোকে নির্ধারিত অবস্থা। বিপ্লবী আদর্শ, লক্ষ্য ও পরিকল্পনার আলোকে গড়ে ওঠা সংগঠিত শক্তির জন্য অব্জেক্টিভ কন্ডিশনকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লব সম্পন্ন করার সক্ষমতা আছে কি না। অর্থাৎ, বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতি কেবল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরই নয়, বরং বিপ্লবী শ্রেনীর আদর্শিক-রাজনৈতিক চেতনা এবং বিপ্লব সম্পাদনে সক্ষমতার উপরও নির্ভর করে। বিপ্লবীরা কি অভ্যুত্থানের পর যথাযথ সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গ্রহণের (প্রতিবিপ্লব প্রতিহত করা, অরাজকতা দূরীকরণ এবং সমাজকে সম্পৃক্ত করে বিপ্লবী আদর্শের আলোকে রাষ্ট্রগঠন) মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম কি না, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

উদাহরণত, আরব বসন্ত বা '৬৯ ও '৯০ এর গণআন্দোলনে আদর্শ ও পরিকল্পনা ছিল না। তাই শুধু অভ্যুত্থান সম্পন্ন হয়েছে, বিপ্লবী লক্ষ্য হাসিল হয়নি।

তবে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য না থাকলেও উলামায়ে কেরাম, দাঈদের মেহনত (অনলাইন, অফলাইন অ্যাক্টিভিজম) নি:সন্দেহে বিপ্লবের অব্জেক্টিভ কন্ডিশনকে ত্বরান্বিত করে।

কিন্তু বিপ্লবী আদর্শ, তত্ত্ব ও চেতনার আলোকে বিকশিত সক্ষম সংগঠিত শক্তি ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সমন্বয় ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত ফলাফল কখনোই আসার নয় আসলে।

সহজভাবে বুঝতে—

In short, in order for a revolutionary situation to turn into a revolution that will replace the old system, the subjective factor must be ripe enough. In other words, there must be a *correct leadership and the *revolutionary class must have a sufficient level of political consciousness and organisation.

বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতি (অর্থাৎ যখন war of position থেকে war of maneuver এ শিফট করা হবে,) কখন হাজির হবে? অর্থাৎ, বিপ্লবের নৈর্ব্যক্তিক পরিস্থিতি (Objective Condition) ও বাস্তব পরিস্থিতি (Subjective Condition) উভয়ই উপস্থিত হবার আলামত কি?

লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী বিপ্লবী পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে আমাদের মতো করে সাজালে যা পাওয়া যায়:

ক. নিপীড়িত জনগণ যখন পুরাতন কায়দায় জীবনযাপন অসম্ভব মনে করবে।

খ. শাসকেরা আর পুরাতন কায়দায় তাদের শাসন চালাতে সক্ষম হবে না।

গ. সুবিধাবাদ ও সামাজিক-উগ্র জাতিবাদকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্থ করে, ইসলামপন্থীদের অগ্রবাহিনী, বিভিন্ন শক্তির কেন্দ্র ও ধারাসমূহকে আদর্শগতভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

ঘ. অবস্থা এমন যে, বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর সমর্থনে ইসলামপন্থী শ্রেণি ও জনসাধারণ এগিয়ে আসবে এবং সমাজের মূখ্য স্টেকহোল্ডাররা (সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি) বিপ্লবকে মেনে নিবে, সক্রিয় বিরোধিতা বা প্রতিহত করতে আসবে না।

ঙ. জনগণকে এই নতুন অবস্থানে টেনে আনার জন্যে অগ্রবাহিনীর মধ্যে ইসলামপন্থীদের তত্ত্ববাগিশতা এবং তার ভুলত্রুটিসমূহকে নির্মূল ও দূরীভূত হবে।

চ. তোতা পাখির মতো করে আবৃত্তি ও পুনারাবৃত্তি করা 'বিক্ষুব্ধ' রাজনৈতিক/ কৌশলগত রেটোরিক শুনে শুধু নয়, নিজেদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অর্জিত বোধের আলোকে জনগণকে উপলব্ধি করানো হবে—"বিপ্লব কেন প্রয়োজন এবং কেন তারা বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিপ্লবী শ্রেণির এই অগ্রবাহিনীকে সমর্থন করবেন।"

ছ. বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে শক্তিসমূহ আছে সেই সম্ভাব্য প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের (যেমন, সামরিক বাহিনীর ইসলামবিরোধী ও দেশবিরোধী অংশ, পশ্চিমা বা ভারতীয় চিন্তায় প্রভাবিত লিবারেল রাজনৈতিক দলসমূহ—যারা ইসলামপন্থীদের মেহনত ও কুরবানির ফল নিজেদের ঘরে তুলতে চাইবে), নিজেদের মধ্যে বিপ্লব প্রশ্নে এমন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে যার কোনো মীমাংসার পথ থাকবে না এবং যার ফলে তারা নিজেরা দুর্বল হয়ে পড়বে। বিপ্লবকে মেনে নেয়ার বিকল্প তাদের থাকবে না।

জ. সেক্যুলার শাসকগোষ্ঠী ছাড়াও সমস্ত দোদুল্যমান এবং অদৃঢ়, শিথিলপন্থী সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ (যেমন—জামায়াতে ইসলামি-বিএনপির মতো দল, মিডিয়া, একাডেমিয়া ইত্যাদি) নিজেদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার মাধ্যমে জনগণের চোখে যথেষ্ট পরিমাণে উলঙ্গ, খেলো এবং মর্যাদাহীন হয়ে পড়বে।

ঝ. ব্যাপকভাবে বিপ্লবী শ্রেণির মধ্যে দৃঢ়, সাহসী এবং একনিষ্ঠ বিপ্লবী সংগ্রামের একটা চেতনার দ্রুত বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটবে। লেনিনের মতে,

উপরোক্ত শর্তগুলো পূরণ হওয়ার ফলে যে বিপ্লবী পরিস্থিতি (Objective Condition) সৃষ্টি হবে সেই

> পরিস্থিতিতে সামগ্রিক অবস্থাকে (Subjective Condition) যথাযথভাবে পরিমাপ করে চূড়ান্ত সংগ্রামের সঠিক মুহূর্তটি যদি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় একমাত্র তাহলেই সাফল্য অর্জিত হবে, অর্থাৎ বিপ্লব ঘটবে, অন্যথায় নয়।

ঞ. মুসলিমদের অনুসরণীয় উলামায়ে কেরাম, তালেবে ইলম, দাঈ-অ্যাক্টিভিস্ট ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে (সর্বোপরি জনসাধারণকে) বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। উদ্ভূত পরিস্থিতিই যেন তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে সেটা খেয়াল রাখা গেলে, তা অর্জন তুলনামূলক সহজ হবে।

ট. শাসক শ্রেণিসমূহকে এমন একটি রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়তে হবে যা জনগণের সব থেকে পশ্চাৎপদ অংশকেও রাজনীতিতে টেনে আনবে, সরকারকে দুর্বল করবে এবং বিপ্লবীদের দ্বারা তার দ্রুত উচ্ছেদকে সম্ভব করবে।

সহজভাবে অল্প কথায় বললে- বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য থাকতে হবে চতুর্বিধ শর্ত:

> ক. শাসকশ্রেণির অভ্যন্তরীণ সংকট,
>
> খ. তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারানো,
>
> গ. জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং
>
> ঘ. সমগ্র জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী বিপ্লবী রাজনৈতিক দল, সে দলের সক্রিয়তা ও নেতৃত্ব। যে দলের শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই নয়, তাকে টিকিয়ে রাখা ও আরও অগ্রসর করে নেওয়ার মতো যথেষ্ট নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে সক্ষমতা রয়েছে।

এখন, আমাদের চারপাশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনপ্রক্রিয়া, আভ্যন্তরীণ কাঠামো, রাজনৈতিক লাইন ও আদর্শিক তরবিয়তের বাস্তবতা সকলের সামনেই রয়েছে। তাই শুধুমাত্র আকিদা-মানহাজের সাধারণ বুঝকে সামনে রেখে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের দিকে তাকিয়ে থেকে চূড়ান্ত সফলতার কাছাকাছি দলগুলোর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় কেন, তা আশা করি যে কেউ উপলব্ধি করবেন। যদি নির্মোহভাবে বোঝার চেষ্টা করা হয় আর কি।

গণতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামি পরিবর্তন যে অসম্ভব তা ইসলাম, গণতন্ত্র, সংসদীয় রাজনীতি ও বিপ্লবের ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা রাখা ব্যাক্তিমাত্রই জানে।

আমি বলতে চাচ্ছি, ১৯৭১ এর মত রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধ বা ১৯৬৯ বা ৯০ এর মত গণঅভ্যুত্থান সত্ত্বেও- এদেশে সাধারন গণতান্ত্রিক বিপ্লবই সফল হয়নি। আর এমনটাই হবার ছিল। কেননা, বিপ্লবী সংগঠন, আদর্শকে সামনে রেখে প্রধাণ দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে রাজনৈতিক মেরুকরণে নের্তৃত্ব প্রদানে সক্ষমতা ব্যাতীত স্রেফ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততার দিকে তাকিয়ে থাকা মানুষের আত্মত্যাগই নিশ্চিত করবে কেবল। বিশেষ আর কিছু অর্জন হবে না।

১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকায় বদরুদ্দীন উমর লিখেন,

> "জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর নির্ভর করে যে রাজনীতি গড়ে ওঠে, তার দ্বারা জনগণের মুক্তি আসতে পারে না-এ কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের কোনো রাজনৈতিক মূল্য নেই অথবা তাকে কোনো প্রকারেই কাজে লাগানো যায় না। মোটেই তা নয়। উপরন্তু জনগণের এই বিক্ষোভ জনগণ কর্তৃক শাসক দলের পরিবর্তন কামনা সমাজে যে বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, সে পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকারের কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চিন্তা ও প্রচেষ্টা কোনো সমাজেই সম্ভব নয়।
>
> স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বল্পকালের জন্য জনগণ একটা উত্তাল তরঙ্গের মতো সমাজে ভেসে উঠলেও রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগঠনের অভাবে তাঁরা নিজেদের শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে পারেন না। তাঁদের ক্ষমতা হয় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এজন্য তাঁদের ক্ষণস্থায়ী বিক্ষোভ আন্দোলনের পর যাঁরা ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা জনগণের কেউ নন। নিজেদের শ্রেণিস্বার্থেই কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত জনগণকে তাঁরা প্রয়োজন ও সুযোগমতো শাসন ও শোষণ করেন।"

এটাও স্মর্তব্য যে- আদর্শিক চেতনা, গণভিত্তি ও সাংগঠনিক শক্তি প্রতিটিই সফল বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য অনিবার্য। যে কোনো

একদিকে হেলে পরে শতসহস্র বছরের মেহনত আমাদের ফলাফল দিবে না। আন্তরিকতা, আত্মত্যাগ বা আত্মতুষ্টির পরিমাণ যেমনই হোক না কেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আশা করি দ্বীনের কর্তৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের রূপরেখা কেমন হতে পারে, প্রাথমিকভাবে তার একটি ধারণা সংক্ষেপে তুলে ধরা সম্ভব হলো। আর বিস্তারিত আলোচনার স্থানও এটি নয়।

আর সবশেষে যা না বললেই নয়, এ লক্ষ্য অর্জনে বিশুদ্ধ আকিদা, সুনির্দিষ্ট মানহাজ ও পরিকল্পনার আলোকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সংগঠিত শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠা এবং দ্বীন কায়েমের পথে সার্বক্ষনিক ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্বের প্রতি সজাগ থাকা অপরিহার্য।

[২]

আমাদের ইমামরা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে "জীবনের প্রতি আসক্তি আর মৃত্যুর ভয়কে পদদলিত করতে সক্ষম মুজাহিদীনদের জামাত ছাড়া মানবতার উদ্ধার ও অস্তিত্ব রক্ষার আশা কিছুতেই করা যায় না।"

দুনিয়ার তুচ্ছতা, আত্মপ্রেম আর আত্মকেন্দ্রিকতার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা ছাড়া ইসলামের মহান দাওয়াত ও আন্দোলনের সফলতার কথা চিন্তা করা অসম্ভব। আর নিজের প্রতিষ্ঠা বা প্রসারের পরিবর্তে আল্লাহর দ্বীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ফিকর ব্যতীত আমরা সফল হব না এটাও মনে রাখা জরুরী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَ هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَکُمۡ خَلٰٓئِفَ الۡاَرۡضِ وَ رَفَعَ بَعۡضَکُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبۡلُوَکُمۡ فِیۡ مَاۤ اٰتٰىکُمۡ ؕ اِنَّ رَبَّکَ سَرِیۡعُ الۡعِقَابِ ۫ۖ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

> আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে জমিনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আনআম, ৬:১৬৫)

অর্থাৎ, মাঝে মেধা, শক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সম্পদ ইত্যাদি নিয়ামতের তারতম্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেছেন। কারো সম্পদ আছে বেশী তো মেধার স্বল্পতা রয়েছে, কারো জ্ঞানের প্রাচুর্য রয়েছে তো শারীরিক শক্তির ঘাটতি রয়েছে। মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাই প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব হল, তাকে যা দেয়া হয়েছে তার সবটুকু দিয়ে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের মেহনতে অগ্রসর হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সততা বজায়কারী প্রত্যেকের জন্য অবশ্যক, ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত তাওহিদ বাস্তবায়নের দাওয়াতের পথে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া।

বেঁচে থাকার তা কতই না মহান উদ্দেশ্য।

মৃত্যুবরণের জন্য কতই না উপযুক্ত এই কারণ।

ইসলামের পুনর্জাগরণের এই শতাব্দীতে কোনো মুসলিমই, বিশেষত মুজাহিদদের পথের অনুসারীগণ যেন বিপ্লবী আন্দোলনের পথে কোনো প্রচেষ্টা বা সুযোগকে হাতছাড়া না করেন। বাহ্যত তা যতই হালকা মনে হোক না কেন। উদাসীনতা, গাফেলতির ব্যাধি যেহেতু আজ ব্যাপক, তাই সময়গুলো বিপ্লবী মেহনতে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশী সচেতন ও উদ্যমী হওয়া কাম্য। নিশ্চয় আদম সন্তান কিছু সময়েরই সমষ্টি। তার একটি দিন চলে যাওয়া মানে নিজ সত্তার একটি অংশও চলে যাওয়া।

"পরে করব" বা "এখন থাকুক" মানসিকতা সম্পূর্ণই পরিত্যাজ্য। কেননা এই মহান আমানত এতই ভারী যার আহ্বানে আমাদের ইমাম, নবিগণের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়েছিল এবং দুনিয়া ত্যাগের আগ পর্যন্ত ন্যূনতম বিশ্রামও গ্রহণ করেননি।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ

হে বস্ত্রাবৃত!

قُمْ فَأَنذِرْ

উঠ, অতঃপর সতর্ক কর।

(সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪:১-২)

উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব (رحمه الله) বলেন,

"মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দানের অক্ষমতার কারণে মানবতা আজ মহাদুর্যোগ ও অধঃপতনের শিকার হয়েছে। মানবতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আজ বিশ্বনেতৃত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রয়োজন ইসলামের সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের, যার আবির্ভাব ঘটেছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং জাহেলিয়াত থেকে জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের দিকে বের করে আনার জন্য।

পৃথিবীতে (ও সকল জাতিতে) ইসলামের নেতৃত্ব অপরিহার্য এবং এর অনুপস্থিতির কারণে শুধু মুসলিম জাতি নয়, বরং সমস্ত মানব জাতি ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বস্তুত এই জাতির পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তা সবকিছুকেই ঘিরে আছে"।

অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এই দাওয়াতের সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব, গুরুত্ব এবং প্রয়োজন অনুধাবন করা এখন অনেক সহজ। জাহেলিয়াতের কদর্যতা ও বাস্তবতা উৎকটভাবে আজ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবনের অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে মানুষ।

ইসলামি উম্মাহর সামনে আজ তার ছিনতাই হওয়া নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করার সর্বোত্তম সময় ও সুযোগ। যদি উম্মাহ'র (নিবেদিতপ্রাণ দা'ঈরা) উঠে দাঁড়ায় এবং ইখলাস, আত্নত্যাগ, উদ্যম ও সংকল্পের সঙ্গে (তাওহিদ ও শরীয়াহর কর্তৃত্বের) দাওয়াত বুকে ধারণ করে জাতিকে আহ্বান করে আস্থার সাথে, দরদের সাথে, মমতার সাথে, কল্যাণকামিতার সাথে; যুক্তি, শ্রদ্ধা আর আচরণ দিয়ে যদি বোঝাতে পারে যে, এটাই একমাত্র পথ যা জাতিকে পতন ও অধঃপতনের চরম পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে, তবে শীঘ্রই উম্মাহ'র হারানো নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, ইন শা আল্লাহ।

কবির ভাষায়,

এ ভূমি এখন বড় সিক্ত, উর্বর ও উপযোগী,

চাই শুধু উন্নত বীজ আর দরদী কৃষক।"

তাই নবিগণের প্রকৃত বিপ্লবী উত্তরসূরীরা ঈমান ও দাওয়াতের শক্তি এবং আল্লাহ্ তা'আলার নুসরতকে সঙ্গী করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান আমানত পূরণে হবেন আগের চেয়েও আরও উদ্যমী ও দৃঢ়।

ইসলামের পথ কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেহনত ও কুরবানীকে সমর্থন করে না। এ পথের বাস্তবতা এমন নয় যে, কোনো ব্যক্তি বা জামাত কিছু সময় চেষ্টা সংগ্রাম করার পর আরাম-আয়েশ ও অবসর যাপনের দিকে মনোনিবেশ করবে। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকবে যে—'সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে ফেলেছে এবং বাকিরা এসে তার পথ ও সফর পরিপূর্ণ করে দিবে।'

এভাবেই শয়তান এসকল ধারণাকে সুশোভিত করে। এমনটা কখনই ইসলামি চিন্তা-ফিকরের ফলাফল নয়! নিশ্চয়ই ইসলামের পথ এমন নয়। বরং ইসলাম হলো অবিরত চেষ্টা-সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও জিহাদের নাম, যা চলমান থাকবে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত, আজীবন।

একজন দা'ঈ পরোয়া করেনা সে জীবনে তার দাওয়াতের পূর্ণাঙ্গতা দেখে যেতে পারলো কি না। কেননা সে জানে, দা'ঈদের ইমাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন কিন্তু নিজে জীবদ্দশায় তা দেখে যাননি। একইভাবে, আমাদের ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রাহঃ, উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব রাহঃ এর দাওয়াত পূর্ণাঙ্গতা পাওয়ার

পূর্বেই শাহাদাত বরণ করেছেন। কিন্তু উনাদের যোগ্য উত্তরসূরিগণ তাওহিদের আমানত বহন করে সমগ্র দুনিয়াতে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আমাদের কর্তব্য এই মহান পূর্বসূরিদের দাওয়াতকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, তাওহিদ প্রতিষ্ঠার বিশুদ্ধ মানহাজ তথা দাওয়াহ ও জিহাদের পথকে সম্ভাব্য সকল উপকরণকে কাজে লাগিয়ে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করা, যেন কাংখিত বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভ হয়ে যায়।

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ

وَرَاَیۡتَ النَّاسَ یَدۡخُلُوۡنَ فِیۡ دِیۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

> "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন; তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।" (সূরা আন-নাসর, ১১০:০১-০৩)

প্রত্যেক আন্তরিক ইসলামপন্থীর জন্য আবশ্যক যে, ব্যক্তি ইসলামের পথে বিপ্লবী মেহনতে সময় ও শ্রমের সবটুকু ব্যয় করবে। মুসলিমরা প্রকৃত শান্তির খোঁজ একমাত্র জান্নাতে পাবে। আর এ বিষয়টি উপলব্ধি করা যায় পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতগুলো থেকে যেখানে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দাদের সাথে মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰی مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمُ الۡجَنَّةَ ؕ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ فَیَقۡتُلُوۡنَ وَ یُقۡتَلُوۡنَ ۟ وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقًّا فِی التَّوۡرٰىۃِ وَ الۡاِنۡجِیۡلِ وَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَ مَنۡ اَوۡفٰی بِعَهۡدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسۡتَبۡشِرُوۡا بِبَیۡعِكُمُ الَّذِیۡ بَایَعۡتُمۡ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ

> নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য। (সূরা তাওবা, ৯:১১১)

অতএব ক্রয়-বিক্রয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে; এতে কোন ধরনের কমবেশী করার সুযোগ নেই, নেই প্রত্যাহারের সুযোগ। উপরের বিষয়টি যদি আমরা ভালোভাবে অনুধাবন করে থাকি তো আমরা নিম্নোক্ত হাদীসের মর্মও বুঝতে সক্ষম হবো ইন শা আল্লাহ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ-

إنما الناسُ كإبلٍ مائة لا تكاد تجدُ فيها راحلةً متفق عليه.

> "নিশ্চয়ই মানুষ এমন একশোটি উটের ন্যায়, যেগুলোর মধ্যে হতে আরোহনযোগ্য একটি উট পাওয়া যাওয়াও দুর্লভ।" (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তাওফিকপ্রাপ্ত বান্দারা হলেন এমন বাহনের ন্যায়, যা সফরের কষ্ট সহ্য করতে পারে এবং শেষপর্যন্ত গন্তব্যে পৌছাতে পারে।

আর সর্বোত্তম কথা তা ই, যা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاصۡبِرۡ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لَا یَسۡتَخِفَّنَّكَ الَّذِیۡنَ لَا یُوۡقِنُوۡنَ

> "অতএব আপনি সবর করুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা দৃঢ়বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।" (সূরা আর-রুম, ৩০:৬০)

এই আয়াতের ব্যাপারে আল্লামা সা'দি (রহ.) বলেন,

> "সুতরাং আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতেও

লেগে থাকুন। তাদের কাছ থেকে বিমুখ হওয়া দেখলেও তা যেন আপনাকে আপনার কাজ থেকে বিমুখ না করে। আর বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহর ওয়াদা হক। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা বিশ্বাস থাকলে আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হবে।

কারণ, বান্দা যখন জানতে পারে যে, তার কাজ নষ্ট হচ্ছে না, বরং সে সেটাকে পূর্ণমাত্রায় পাবে, তখন এ পথে যত কষ্টের মুখোমুখিই সে হোক না কেন, সে সেটাকে ভ্রূক্ষেপ করবে না, কঠিন কাজও তার জন্য সহজ হয়ে যায়, বেশী কাজও তার কাছে অল্প মনে হয়, আর তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যায়।"

এবং, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ

"অতএব আপনি সবর করুন যেমন সবর করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দণ্ডের বেশী দুনিয়াতে অবস্থান করেনি। এ এক ঘোষণা, সুতরাং পাপাচারী সম্প্রদায়কেই কেবল ধ্বংস করা হবে।" (সূরা আল-আহক্বাফ, ৪৬:৩৫)